বাঁধন বাড়ি

বাঁধন বাড়ি
মোহনা জাহ্নবী

অধ্যয়ন
একমাত্র পরিবেশক তাম্রলিপি

বাঁধন বাড়ি
মোহনা জাহ্নবী

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

অধ্যয়ন : .....

প্রকাশক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি
অধ্যয়ন প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রচ্ছদ
.....

বর্ণ বিন্যাস
অধ্যয়ন কম্পিউটার

মুদ্রণ
.....

মূল্য : .....

Badhon Bari
By : Mohona Jahnvi
First Published : ....., by Tasnova Adiba Shanjute
Addhayan Prokashoni, 38/4, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price: 00

ISBN : .....

অঞ্জলি

আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দর পরিবারকে—**'বাপকা বেটা পরিবার'**।
এমন সুন্দর পরিবার থাকলে যেকোনো বাড়ি হয়ে ওঠে বাঁধন বাড়ি!

অরুন্ধুতী ভৌমিক

মৌসুমি সাহা জুঁই

ঋতুরাজ ভৌমিক

সুখেন্দু বিকাশ ভৌমিক

শুভাশীষ ভৌমিক

তোমাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা রইল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই উপন্যাসটা লেখার আগে একবার বাড়ি যাওয়া খুব প্রয়োজন ছিল। গিয়েছিলামও সুযোগ করে। ভেতর বাড়ি, বহির্বাটি, ভিটে, ফসলের মাঠ, বাড়ির আনাচেকানাচে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি সব। নোটপ্যাডে নোট করেছি দেখতে দেখতে, পুরনো স্মৃতিচারণ করেছি। তখন আমার সঙ্গী হয়ে পাশে ছিল **'অরিন'**। বাড়িতে গেলে ও আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। সেই ছোটবেলা থেকে আমার সাথে সাথে থাকা ওর প্রিয় অভ্যেস। সেই আদরের অরিনের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, আমার কাজে সহযোগিতা করার জন্য।

উপন্যাস লেখার সময় বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে বারবার **'আম্মা'কে** প্রশ্ন করেছি। আম্মা আনন্দের সাথে সবকিছুর উত্তর দিয়েছে। আম্মার এই আনন্দের সাথে করা সহযোগিতাটুকু আমাকে উপন্যাস লিখতে সাহায্য করেছে। আম্মার প্রতিও অশেষ কৃতজ্ঞতা।

উপন্যাসটার নাম কী দিবো, তা নিয়ে দ্বিধায় ভুগছিলাম। এমন সময় একদিন **'তামান্না সেতু'** আপুর ফেসবুক পোস্ট দেখলাম– *"ঈদে আমাদের বাড়িতে আসার একটা বাড়ি আছে। শুধু এই কথাটুকু বলতে পারার জন্য কী অমানবিক পরিশ্রম করেছি!"* এ লাইনগুলো আমার মনে ভীষণভাবে দাগ কেটে গেল। তারপরই সিদ্ধান্ত হলো, আমার এ উপন্যাসটার নাম হবে **"বাঁধন বাড়ি"**। তামান্না সেতু আপুর বহু কষ্টে বানানো বাড়িটার নামে আমার উপন্যাসটার নাম রাখলাম। কৃতজ্ঞতা প্রিয় তামান্না সেতু আপুর প্রতি, আমাকে দ্বিধার পাহাড় ভেঙে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করার জন্য।

ভূমিকা

নিজের বাড়ি নিয়ে এত এত স্মৃতি, কোথা থেকে শুরু করবো, কোথায় শেষ করব ভেবেই পাচ্ছিলাম না। তাই লিখব লিখব করে উপন্যাস লেখায় হাত দিই বেশ দেরিতে। জুলাই এর উনিশ তারিখে সাহস নিয়ে শুরু করে দিই লেখা। তারপর নানান ঝুটঝামেলায় মাসখানেক লেখার সুযোগ হলো না। দোলাচলে দুলতে দুলতে লেখা শেষ করলাম সেপ্টেম্বরের ছয় তারিখে। অর্থাৎ খুব অল্প সময়েই লিখে শেষ করেছি। তবুও বিশ্বাস রাখছি, পাঠক অসন্তুষ্ট হবে না বইটা পড়ে। গতবছর "ICU থেকে বলছি" উপন্যাসটা লিখেছিলাম আমার বাবার মৃত্যু নিয়ে। এ বছর "বাঁধন বাড়ি" উপন্যাসটা লিখেছি বাবার চলে যাওয়ার পর আমাদের বাড়ির শূন্যতা নিয়ে। তাই স্মৃতিচারণায় আগের বইয়ের সাথে এ বইয়ের কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে স্বাভাবিকভাবেই। আশা করি, পাঠক তা বুঝতে পারবে।

আমাদের বাড়িটা প্রথমবারের মতো ম্লান হতে শুরু করেছিল যখন আমি আর আমার বড় বোন শহরে পড়তে এসেছিলাম। তার কিছু বছর পর দাদা মারা গেল। তখন আরও ভয়ানকভাবে শূন্যতা গ্রাস করল। দাদার মৃত্যুর বছর দুয়েক পরেই বাবা চলে গেল। বাবার মৃত্যুর পর বাড়িটার আলো যেন চিরকালের মতো নিভে গেল। বাড়িও হয়তো তার ঘরের মানুষের অপেক্ষায় থাকে। তাই বাড়ির জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষের মতো অনুভূতি নিয়ে আমি তুলে ধরতে চেয়েছি একটা পরিত্যক্ত বাড়ির আত্মকথা। যেই গল্পে ফুলঝুরি ঐ বাড়ির সর্বশেষ এবং বেঁচে থাকা একমাত্র সদস্য। বাকি সবাই জীবনের হাটে বেচাকিনি শেষে ওপারে পাড়ি জমিয়েছে। সেই ফুলঝুরিই অনেক বছর পর বাঁধন বাড়িতে আসে। বাড়িটা তাকে খুঁটিনাটি সব জিনিসের গল্প শোনায়, সবকিছুর সাথে নিবিড়ভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়। মোট কথা হচ্ছে, আমি আমাদের পুরো বাড়িটাকেই আঁকতে চেয়েছি শব্দের মাধ্যমে; যেন বাড়িটা কোনোদিন পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও আমার বইয়ের মাঝে বেঁচে থাকতে পারে। বলা বাহুল্য যে, বাস্তবতার সাথে কিছুটা কল্পনাও মেশানো হয়েছে গল্পের প্রয়োজনে।

নিজের বাড়িকে ঘিরে অসংখ্য স্মৃতি থাকে, তা অল্প কিছু পৃষ্ঠায় তুলে ধরা সম্ভব নয়। আসলে তা লিখেও পুরোপুরি প্রকাশ করা যায় না। তবু যেটুকু লিখলাম, পাঠক তা ভালোবেসে গ্রহণ করলেই আমি তৃপ্ত হব। যদিও বেশিরভাগই রয়ে গেল অলিখিত, পাঠক তা পড়ে নেবে আমার চোখে চেয়ে। সেখানে এক পৃথিবী স্মৃতিকথা জমা আছে!

মোহনা জাহ্নবী

০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২

ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কাঁঠালবাগান, ঢাকা

আজ অনেকদিন পর এ বাড়িতে আলো জ্বলবে। ভাবতেই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যাচ্ছে মন। আচ্ছা, জড় পদার্থেরও কি মন থাকে? এ প্রশ্নটা আমার নয়, মানুষের। তারা জানে না, জড় পদার্থেরও মন থাকে, তবে সেই মন সবাই ছুঁতে পারে না। যারা কোনোদিন একটা শিমুল তুলোর বালিশের জন্য, সেগুন কাঠের ফার্নিচারের জন্য কিংবা ধুলো পড়ে যাওয়া আয়নার জন্য কেঁদেছে, কেবলমাত্র তারাই জানে জড়পদার্থেরও মন আছে!

এখন শীতকাল বিরাজ করছে প্রকৃতিতে। চারপাশ কেমন নিঃস্ব রিক্ত মনে হয় শীতকাল এলে। আমার শরীর জুড়ে যেন আরও আরও বিষাদের শ্যাওলা জমে। যত্ন করে সেই শ্যাওলা তুলে ফেলার মতো কেউ নেই। অথচ একদিন সব ছিল আমার, আমিও বসন্তের মতো পরিপূর্ণ ছিলাম। সেসব দিনের স্মৃতি বুকে আঁকড়ে নিয়েই কী নিদারুণভাবে বেঁচে আছি বছরের পর বছর!

একদিন আমার কাছে নিশ্চয়ই কেউ আসবে, সে এসে আলো জ্বালবে, খুলে দেবে আমার সব ভঙ্গুর জানালা, এসব প্রত্যাশা আছে বলেই হয়তো এত এত যন্ত্রণার ভাগাড়ে দাঁড়িয়েও কখনো কখনো মনে হয়, জীবন সুন্দর, অচীন বৃক্ষের মতো এভাবে ভিটেমাটি জুড়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দর, আরও বেশি সুন্দর কারো জন্য এমন ব্যকুল হয়ে অপেক্ষা করা!

মানুষ যেমন শেকড়ের কাছে ফিরতে চায়, নিজের বাড়িতে ফিরতে চায়, বাড়িও তেমনই নিজের মানুষ ফেরার অপেক্ষায় থাকে। সবাই সেই অপেক্ষা টের পায় না, সেই ব্যকুলতা অনুভব করতে পারে না, কেউ কেউ পারে!

ফুলঝুরি। এখন পর্যন্ত এ বাড়ির শেষ আপনজন। তারপর আর কোনো আপনজন আসবে কি না পৃথিবীতে কিংবা আসলেও আমার দেখার সুযোগ হবে কি না, সে ব্যাপারে আমি সন্দিহান। অযত্নে, অবহেলায় কেমন যেন মরে যাচ্ছি আমি, জল না পাওয়া বৃক্ষের মতো। হয়তো আর মাত্র কয়েক বছর জোরপূর্বক বেঁচে থাকব। তারপর শূন্যে মিলিয়ে যাব!

ফুলঝুরি আজ আসবে এ বাড়িতে। এখানে এখন আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না। সে আমাকে দেখতে আসবে, দেখতে আসবে তার সব প্রিয়জনদের কবর। ফুলঝুরি পাঁচ বছর বয়সে দেশ ছেড়েছিল। তারপর বিভিন্ন দেশে তার বেড়ে ওঠা, পড়াশোনা। এখন সে থাকে কানাডায়। যারা একবার বিত্ত বৈভবের দেশে স্থায়ী হয়ে যায়, তারা সহজে আর সময় করে উঠতে পারে না শেকড়ের কাছে ফিরে আসার। তবু ফুলঝুরি অনেক দিন বাদে বাদে এসে ঘুরে যায়। দেশের বাইরে চলে যাবার পর এ পর্যন্ত তার চার থেকে পাঁচবার আসা হয়েছে। শেষবার এসেছিল যখন তার বাবা-মা মারা গেল সড়ক দুর্ঘটনায়, তখন। সে দেশে ফিরেছিল তাদের মৃতদেহ নিয়ে। অল্প সময়ের জন্য আসা হয় বলে তাকে কখনো আমার সাথে নিবিড়ভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি। অবশ্য পরিচয় হয়েছে বলা চলে, কিন্তু গভীর সখ্যতা গড়ে ওঠেনি। এবার তাকে আমি সবকিছুর সাথে ভালোভাবে পরিচয় করিয়ে দেবো। সে যে এবার শুধু শেকড়ের সন্ধানেই আসছে, শেকড়ের সাথে মিশে যেতেই আসছে!

ঐ তো ফুলঝুরি এসে গেছে। বহির্বাটির নাকবারান্দা থেকে মূল সড়ক পর্যন্ত লম্বা সিমেন্টের রাস্তা। মূল সড়কে এসেই রিক্সা থেকে নেমেছে সে। সিমেন্টের ঐ রাস্তাটুকুতে শ্যাওলা জমেছে, দিনের পর দিন একটু একটু করে মাটি জমে সেখানে ঘাসও গজিয়েছে, কোথাও কোথাও ইট খসে গেছে, ভেঙে গেছে। পথটা যে এখন আর নিয়মিত ব্যবহৃত হয় না। যাতায়াতের প্রয়োজনে আশপাশের কেউ কেউ এ পথ একটু আধটু ব্যবহার করলেও

যত্নের অভাবে আজ তার বেহাল দশা। সিঁড়ির কাছে এসে থামলো সে। ব্যাগ থেকে চাবি বের করল। কয়েক বছর পর দরজাটা খুলল কেউ, বাইরের বাতাস প্রবেশ করল ঘরে!

এ দরজাটা বানানো হয়েছিল আমার কোলে বেড়ে ওঠা ছোট মেয়ে মেঘবতীর পছন্দে। মেহগনি কাঠ বিধায় এত বছর পরেও দরজাটা নষ্ট হয়নি। এ বাড়িতে একসময় সব ঘর জুড়ে আলো জ্বলতো, এমনকি উঠোনে ও নাকবারান্দাতেও বাল্ব এর সুব্যবস্থা ছিল। অনেকদিন কেউ না থাকায়, মাসের পর মাস বিল বকেয়া থাকায় বিদ্যুৎ এর লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। ফুলঝুরি তার সেলফোনের আলো জ্বালিয়ে খানিক অন্ধকার দূর করল। ঘর জুড়ে এখন ইঁদুরের রাজত্ব, ঝুল জমে গেছে সারা বাড়িতে, বসবার মতো এক রত্তি জায়গা নেই, ধুলোবালির পুরু স্তর পড়ে আছে। এক হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আরেক হাতে সামনে ঝুলে থাকা ঝুলগুলো ভাঙছিল সে। তারপর কয়েকটা জানালা খুলে দিল। জানালাগুলোর ভগ্ন দশা, কোনো কোনো জানালার ছিটকানি খুলতে না খুলতেই কপাট খসে পড়ছে, ছিটকানিগুলোতেও মরচে পড়ে গেছে। পুরো বাড়িতে অনেকগুলো জানালা, সবগুলো জানালার নকশা খুব পুরনো, জানালাগুলোর গায়ে পেস্ট কালার আর গাঢ় অফ হোয়াইট কালার দিয়ে রং করা। এত বছর বাদে রংগুলো অনেকটাই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, অযত্নে কিংবা অবহেলায়। তবু রং চিনতে ভুল হয় না তার। এমন জানালা এখনকার কোনো বাড়িতেই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন অবশ্য সচরাচর এমন টিনের বাড়িও চোখে পড়ে না। গ্রামেগঞ্জেও সবার বাড়িতে এখন বিল্ডিং, নিদেনপক্ষে একতলা সিমেন্টের বাড়ি আছে প্রায় সবার। গ্রামের সেই চিরচেনা রূপ কালের স্রোতে কীভাবে যেন হারিয়ে গেল। সময় খুব অদ্ভুত জিনিস, সে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব, চাইলেও ধরে রাখা যায় না, কেবল পলিমাটির মতো মনের কোণে জমা পড়ে থাকে কিছু পুরনো স্মৃতি!

ফুলঝুরিকে নিয়ে গেলাম একদম ডান পাশের ঘরে। এই কক্ষটা অন্যসব কক্ষের চেয়ে তুলনামূলক ছোট। সবাই এ কক্ষকে বলত 'রুম'। 'এল' আকৃতির বাড়ির শুরুর ঘর বা কক্ষ এটা। রুমের পাশেই যাতায়াতের

জন্য একটা ফান্দি। ফান্দিটা মূলত লিমন-অরিনদের ঘর আর এই ঘরের মাঝখানে অবস্থিত। অরিনদের ঘরের ওপাশে তার সেজো কাকাদের ঘর। এ তিন বাড়ির মানুষ বাইরে যাতায়াতের জন্য এ ফান্দিটা ব্যবহার করত। করত কেন বললাম? কারণ এখন নিয়ম করে এ ফান্দিটা ব্যবহার করার মতো কেউ আর নেই! কেউ কেউ জীবনের লেনাদেনা মিটিয়ে চলে গেছে ওপারে, বাকি যারা আছে তারা কেউ থাকে না এখানে। এ তিন বাড়ি মিলিয়ে এখন যেন এক মৃত্যুপুরী। তবু অন্য দুই বাড়িতে বহু দিন বাদে বাদে কেউ এসে আলো জ্বালে, কিন্তু আমার কাছে কেউ আসে না!

রুমের সাথে লিমনদের ঘর প্রায় লাগোয়া হওয়ায় ওদের ঘরের কথা যেমন সব শোনা যেত, এ ঘরের গল্পও পৌঁছে যেত ও ঘরে। শহরে যেমন এক বাড়ির গল্প অন্য বাড়িতে পৌঁছায় না সাধারণত, গ্রামে তেমনটা ছিল না। ভুল বললাম বোধয়। শহরে তো বাসা হয় কেবল, বাড়ি হয় না কারো! তবে গ্রামও এখন অত্যাধুনিক হবার পথে হাঁটতে হাঁটতে কেমন শহরের মতো কৃত্রিম হয়ে যাচ্ছে। এখানে আর আগের মতো কেউ কারো দুঃখ ছুঁতে পারে না, কারো বিপদে হুড়মুড়িয়ে দলবেঁধে দৌড়ে আসে না, সবাই মিলে মাদুর পেতে বসে আড্ডা জমায় না আর। যদিও পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি এসব, তবে তা প্রায় বিলুপ্ত হবার পথেই!

রুমে একটা চান্দা টাঙানো, আকাশি রঙের। বহু বছরের পুরনো চান্দা, কোথাও কোথাও ইঁদুর কেটে ফেলেছে, কোথাও আবার দড়ির বাঁধন খুলে খসে পড়েছে একেক কোণা। এ রুমে অনেক বছর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে ছিল মেঘবতী। পরবর্তী সময়ে তার নিজের কোনো রুম ছিল না, একেক সময় একেক ঘরে ঘুমাতো। বাড়ি ছেড়ে পড়াশুনার সুবাদে যখন চলে গেল শহরে, তারপর ছুটিছাটায় আসত, কখনো মায়ের কাছে ঘুমাতো, কখনোবা দাদার ঘরে। মূলত বাড়ি ছাড়ার পর থেকেই তার আর ব্যক্তিগত রুম বলতে কিছু ছিল না। মেয়েরা বাড়ি ছেড়ে গেলে বোধয় আর ব্যক্তিগত বলে কিছু থাকে না!

এ রুমে মোট তিনটা জানালা। উঠোনের দিকে একটা, বাকি দুটো বাইরের দিকে। বাইরের দিকের জানালা দুটোয় ওপরে নিচে ছিটকানি

সিস্টেম, উঠোনের দিকের জানালায় নিচে ছিটকানি, ওপরে কাঠের হুক। এমন কাঠের হুকের জানালার প্রচলন নেই অনেক বছর। এই হুক ঘুরিয়ে জানালা লাগানো হয়, আবার হুক ঘুরিয়ে খোলা হয়। জানালার গ্রিলে যেমন মরচে ধরেছে, রং ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, তেমনই জানালার ফ্রেমে লাগানো কাঠে ভাঙন ধরেছে, জিনারিগুলো মরচে পড়ে অকেজো হয়ে গেছে প্রায়। এ বাড়ির কর্তা মারা যাবার পর আর ঠিকঠাক সংস্কার করা হয়নি। অভাব অনটনের সংসারে বাড়ি সংস্কারের সুযোগ আসলে হয়ে ওঠেনি কখনো। নাহলে আমি আরও কয়েক বছর বেশি টিকে থাকতে পারতাম!

আগে এই রুমে একটা খাট, টেবিল আর ফ্রিজ ছিল। সেই খাটে মেঘবতী ঘুমাতো, উঠোনের দিকের জানালা খুলে জ্যোৎস্না দেখত, গরমকালে সারারাত জানালা খুলে ঘুমালেও কোনো দুশ্চিন্তা হতো না, বরং প্রকৃতির ফুরফুরে বাতাস ঘরে প্রবেশ করত বলে ভালো ঘুম হতো। পরবর্তী সময়ে জানালা খুলে ঘুমানোর অভ্যেসটা বাদ দিতে হয়েছিল। কেননা, সময়ের সাথে সাথে নিরাপত্তা ক্রমশ কমে আসছিল সর্বত্র, চারপাশে খারাপ মানুষের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলছিল, মূলত সেভাবেই জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছিল সোনালি সুদিন!

রুমে থেকে সেই খাট একসময় সরিয়ে নেয়া হলো অন্য ঘরে। মেহগনি কাঠের নতুন একটা আকর্ষণীয় নকশার খাট বানিয়ে মেঘবতীকে উপহার দেয়া হলো। নতুন খাট বসাবার জন্য পুরনো খাট সরিয়ে ফেলা হলো, যদিও মেঘবতীর কাছে পুরনো খাটের আবেদন চিরকালীন। নতুনের জন্য চিরকালই এভাবে নির্বিবাদে পুরনোকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। এটাই বোধয় জীবনের নিয়ম!

যেই কাঠের সাদামাটা টেবিলটা ছিল সেখানে, যেখানে মেঘবতী পড়াশোনা করত, সেই টেবিলটাও সরিয়ে ফেলা হলো। টেবিলের সামনের দেয়াল জুড়ে বাতেনের দোকান থেকে কেনা কত স্টিকার লাগানো ছিল। সেসব স্টিকারও হারিয়ে গেল, দেয়ালটাও একদিন নাই হয়ে গেল বাড়ি সংস্কার করার পর। আগে কাঠের মতো হার্ডবোর্ডের দেয়াল ছিল রুমের এক পাশে, সেই দেয়ালে একটা দরজাও ছিল ঐ হার্ডবোর্ডেরই। মূলত অন্য ঘর

থেকে এ ঘরকে আলাদা করার জন্যই ঐ দেয়ালটা ছিল, বাকি দেয়াল ছিল টিনের। পরে হার্ডবোর্ডের দেয়ালের জায়গাতেও টিনের দেয়াল, টিনের দরজা জায়গা করে নিয়েছে। হার্ডবোর্ডের দরজা দিয়ে রুমে প্রবেশ করার সময় দরজার গায়ে, দরজার ওপরের দিকেও অনেক স্টিকার চোখে পড়ত। এখন আর সেসব কিচ্ছু নেই।

কাঠের টেবিলের বদলে একসময় এল ড্রেসিংটেবিল। কিন্তু সেখানে আয়না দেখার জন্য বা বসে বসে সাজার জন্য কেউ ছিল না। কেননা, সরোজিনী আর মেঘবতী দুজনই শহরে পড়াশোনা করত। তবু ড্রেসিংটেবিলটা সেখানে রয়ে গেল অনেক দিন। ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ারগুলোতে মেঘবতী ছোটবেলার অনেক স্মৃতি যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। গ্রামে ফিরলে সেসব স্মৃতি ড্রয়ার খুলে দেখত; যেন জাদুর বাক্স খুলে পুরনো দিনে হারিয়ে যাবার প্রচেষ্টা! তারপর একদিন সেই ড্রেসিংটেবিলটা শহরে নিয়ে যাওয়া হলো, সরোজিনীর সংসার হবার পর। মেহগনি কাঠের সেই ড্রেসিংটেবিলটা মূলত সরোজিনীকে বিয়েতে উপহার দিবে বলেই বানিয়ে রাখা হয়েছিল।

এ ঘরে সাদা রঙের একটা ফ্রিজ ছিল। তখন সারা গ্রামে কেবলমাত্র দুটো বাড়িতে ফ্রিজ ছিল। দূর থেকেও মানুষ মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি রাখতে আসত ফ্রিজে। এত মানুষের মাছ, মাংসের টোপলা হারিয়ে যেতে পারে বলে প্রতিটা টোপলার গায়ে আলাদা আলাদা নির্দেশিকা চিহ্ন দেয়া থাকত। যেমন, কারোটা লাল কাপড় দিয়ে বাঁধা থাকত, কারোটা নীল কাপড় বা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত, কেউ আবার ভেতরে কিছু গুঁজে দিত। বরফের কিউবে সরোজিনী আর মেঘবতী আইসক্রিম বানাতো। কসমস কিংবা বিভিন্ন ধরনের বিস্কুট পানি আর চিনি দিয়ে গুলিয়ে কিউবে ঢেলে ফ্রিজে রেখে দিলে আইসক্রিম হয়ে যেত। সেই আইসক্রিম খেলার বন্ধুদের নিয়ে একসাথে খেত। যেহেতু তখন কারো বাড়িতে ফ্রিজ ছিল না, তাই এসব আইসক্রিম অমৃতের মতো লাগত। একসময় এ বাড়িতে অনেক ধরনের ফসল হতো, পুরোপুরি গৃহস্থ বাড়ি ছিল। রসুনের দিনে যখন উঠোন আর বহির্বাটি ভরে রোদে রসুন শুকানো হতো মচমচে করার জন্য, তখন

বিকেলবেলা ধামা ভর্তি করে সেই রসুন ঘরে তুলত সবাই। এসব কাজে আনন্দ হতো খুব, তাই হাতে হাত লাগিয়ে খেলার বন্ধুরা মিলে কাজে নেমে পড়ত। ঘেমেনেয়ে একাকার হতো সবাই। তখন এসব আইসক্রিম খেয়ে প্রশান্তি পেত। এ ছাড়া মালাইওয়ালার কাছ থেকে অনেক মালাই বা আইসক্রিম কিনেও ফ্রিজে জমিয়ে রাখত মেঘবতী। সেইসব দিন খোয়া গেছে একেবারে!

খুব বেশি বছর কাটেনি তারপর। ঘরে ঘরে ফ্রিজ হয়ে গেল সবার। কাউকে আর অন্যের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হতো না মাছ, মাংস রাখার জন্য। ফ্রিজটার বয়স বাড়ার সাথে সাথে একটু আধটু সমস্যা দেখা দিতে লাগল। ইদ্রিস, সম্পর্কে এ বাড়ির কর্তার দূরসম্পর্কের ভাই। তার ফ্রিজ, টিভি ইত্যাদি সারাইয়ের দোকান ছিল থানা শহরের বাজারে। ফ্রিজে সমস্যা দেখা দিলেই সে এসে সেরে দিত। একসময় ফ্রিজটা একেবারেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেল। তারপর তা দিয়ে দেয়া হলো ঐ ইদ্রিসের দোকানেই। সে যদি চিকিৎসা করে একটু বাঁচিয়ে তুলে অন্যত্র বিক্রি করে দিতে পারে তো ভালো, নয়তো ভাঙারির দোকানে দিয়ে দেবে। এভাবেই সেই ফ্রিজের যবনিকাপাত ঘটল। তবে যবনিকাপাতের কয়েক বছর আগে তাকেও সরিয়ে ফেলা হয়েছিল রুম থেকে, শেষ কয়েক বছর তার জায়গা হয়েছিল অন্য ঘরে। এখনো ফ্রিজটার মেশিন আর বরফের দুএকটা কিউব রয়ে গেছে। প্রয়োজন ফুরোলেও আমরা এভাবে কতকিছু রেখে দেই, হোক তা যত্নে কিংবা অযত্নে!

এ রুমে এখন মেঘবতীর জন্য বানানো বক্সখাটটা ছাড়া কিচ্ছু নেই। কী ভীষণ নিঃসঙ্গ এই খাটটা, যেন গ্রামের মেঠোপথে একলা দাঁড়িয়ে থাকা এক বৃদ্ধ কৃষ্ণচূড়া গাছ! এ খাটে এখন আর গা এলিয়ে দেবার মতো কেউ নেই। খাটে বিছানো তোষক ইঁদুরে কেটে তুলা বের করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে, কোনো চাদর পাতা নেই, শুধু কয়েক টুকরো অব্যবহৃত কাপড় দিয়ে পুরো খাটটা ঢেকে রাখা, যদিও এখন তা এলোমেলো অবস্থায় আবিষ্কার করেছে ফুলঝুরি।